গণিতের জন্মকথা

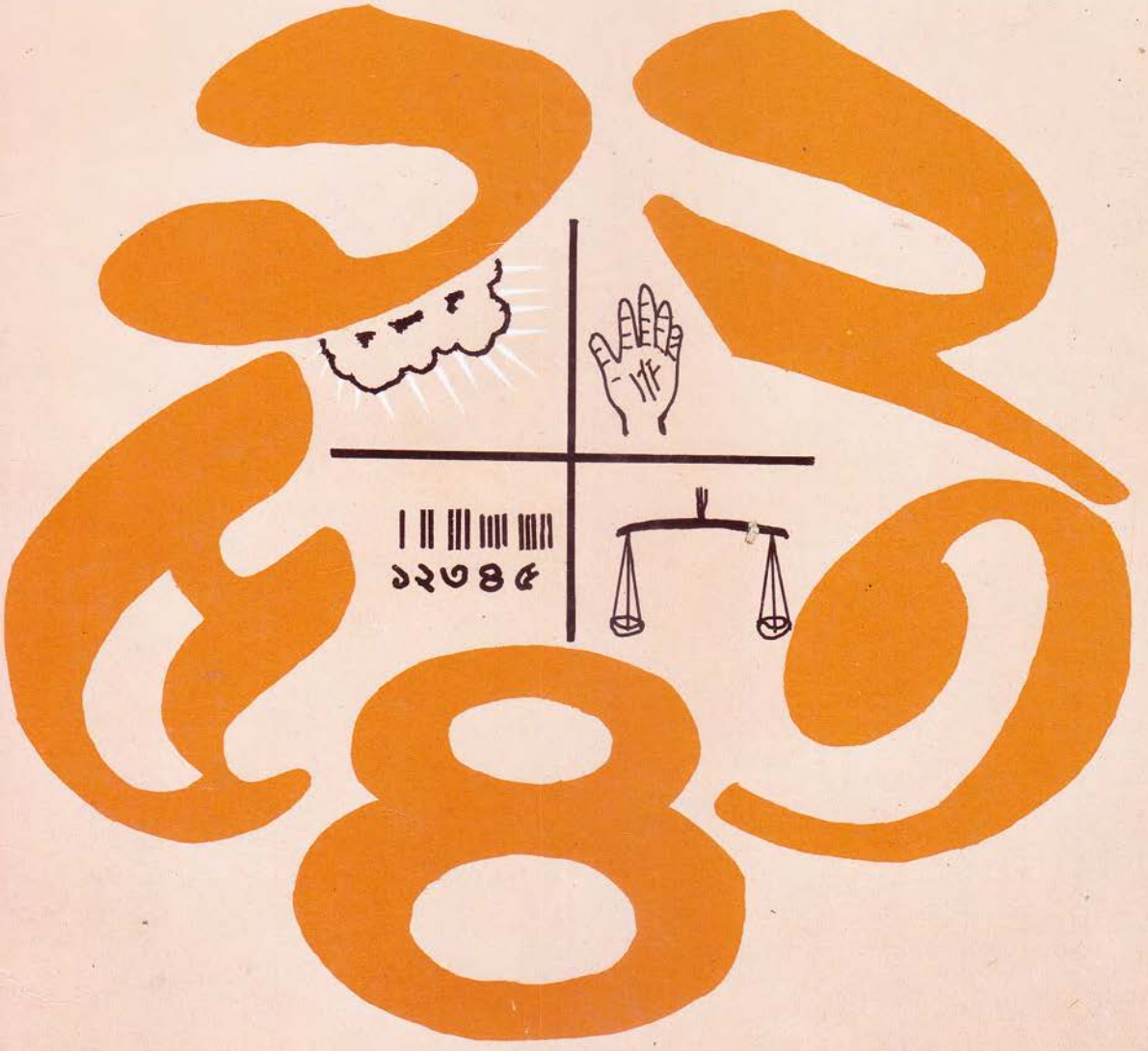

এ.এফ.এম. আবদুর রহমান

গণিতের জন্মকথা

এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

ইফাবা প্রকাশনা : ৩৩০/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৫১০.৯
ISBN : 984-06-1113-5

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮০

দ্বিতীয় সংস্করণ
মে ২০০৭
বৈশাখ ১৪১৪
রবিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রুফ সংশোধনে
মোহাম্মদ মোকসেদ

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৩.০০ টাকা মাত্র

GONITER JANMA-KOTHA (History of the Origin of Mathematics): Written by A. F. M. Abdur Rahman and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 May 2007

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 23. 00 ; US Dollar : 1.00

সূচি

প্রথম অধ্যায়	৫	সূচনা
দ্বিতীয় অধ্যায়	৬	গণিতের জন্ম
তৃতীয় অধ্যায়	৯	সংখ্যাগণনা পদ্ধতি
চতুর্থ অধ্যায়	১২	সংখ্যালিখন পদ্ধতি
পঞ্চম অধ্যায়	১৪	বর্ণমালা দিয়ে সংখ্যা লেখা
ষষ্ঠ অধ্যায়	১৬	প্রাচীন আরব গণনা পদ্ধতি
সপ্তম অধ্যায়	১৭	নতুন গণিতের সৃষ্টিতে মুসলমানের দান
অষ্টম অধ্যায়	২০	অংকের আনন্দ
নবম অধ্যায়	২২	গণিতের তৃতীয় শাখা জ্যামিতির জন্ম
দশম অধ্যায়	২৪	আধুনিক জ্যামিতির জন্ম
একাদশ অধ্যায়	২৬	উপসংহার

প্রকাশকের কথা

গণিত অর্থ গণনাবিজ্ঞান। আমরা যা কিছু দেখি তা কোন না কোন সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করি। আজ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এর মূলে গণিতের অবদান সর্বাধিক। গণিতশাস্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল সংখ্যা গণনার পদ্ধতি থেকে। কিন্তু মানুষ এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি একদিনে আবিষ্কার করেনি। প্রাচীনকালে মানুষ কখনো খাড়া দাগ টেনে, কখনো বা শোয়ানো দাগ টেনে তাদের গণনার কাজ চালাতো। পরবর্তীতে এ দাগগুলোকে মানুষ সংখ্যা-বোধক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এভাবে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রা খাড়া গুঁজির মতো চিহ্ন দিয়ে এক থেকে নয় পর্যন্ত লেখার গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করে। পরবর্তীতে এ থেকেই 'ষাটকিয়া' পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। একে বলা হয় 'কুনিফর্ম'। প্রাচীন মিশরীয়রাও প্রথমে খাড়া লাইন টেনে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা নির্দেশ করতো। তারপর দশ থেকে নব্বই পর্যন্ত ব্যবহার করতো অন্য ধরনের প্রতীক। তাদের এ গণনারীতির নাম হচ্ছে 'হায়ারোগ্লিফিক' পদ্ধতি। কিন্তু তারা কেউ শূন্যের ব্যবহার জানতো না। গণনা পদ্ধতিতে শূন্য সংখ্যার প্রথম ব্যবহার হয় আমাদের এ উপমহাদেশে। সংখ্যা গণনায় শূন্যের আবিষ্কার হচ্ছে গণিত শাস্ত্রের এক মহাবিপ্লব। শূন্য সংখ্যা ভারতীয়রা আবিষ্কার করলেও এর বিশ্বব্যাপী প্রচলন ঘটে আরবীয়দের হাতে। আর এজন্যই বর্তমান গণিত শাস্ত্রে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০ এ দশটি সংখ্যাকে 'আরবী সংখ্যা পদ্ধতি' বলা হয়।

গণিতে প্রথম শূন্য সংখ্যাকে নতুনরূপে সাজিয়ে এর বিকাশ ও আধুনিক রূপ দেন মূসা আল খোয়ারিজমী। প্রকৃত অর্থে তিনিই হচ্ছেন আধুনিক গণিতশাস্ত্রের জনক। আল-খোয়ারিজমীর পর গণিতের এই নতুন শাখায় আরো অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন গণিতবিদ আবুল কালিম খোরাসানী, আবুল ওয়াকা, আল কার্কী, কবি ওমর খৈয়াম প্রমুখ। আল খোয়ারিজমী আধুনিক বীজগণিতেরও জনক। আল খোয়ারিজমীর নাম অনুসারে হিসাব পদ্ধতির এ নতুন নিয়মকে বলা হয় 'আল গরিদম'। আজকাল কম্পিউটারে যে সংখ্যা গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা 'আল গরিদম'-এরই চরম বিকাশ।

আজ ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে তার পেছনে রয়েছে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদান। বিশিষ্ট লেখক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান তাঁর ছোটদের জন্য লেখা 'গণিতের জন্মকথা' শীর্ষক বইটিতে গণিতের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মুসলিম অবদানের কথাও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা আশা করি এ বইটি পাঠ করে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেমন ঐতিহ্য সচেতন হবে তেমনি উৎসুক হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতিও। বইটি ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ সোনামনি শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

আজ তোমাদের বলবো গণিত বা অঙ্ক শাস্ত্রের জন্মকাহিনী। তার কিছু অতীত ইতিহাস তোমাদের জানাবো। তোমরা তো সবাই এক দুই তিন করে একশ', কেউ কেউ এক হাজার পর্যন্ত গুণতে পারো। এই গণনা থেকেই কিন্তু গণিতের উৎপত্তি।

আজ তোমরা যত সহজে গণনা শিখ্‌ছো সব সময় তা এত সহজ ছিলো না। অনেক অনেক সাধ্য সাধনার পর তবেই না আজকের এই গণনার নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে। লেখার কথা না হয় বাদই দেওয়া হলো। তোমরা আজ যে অতি সহজে এক দুই তিন লিখে ফেলছো তার পেছনেও আছে অনেক দিনের সাধনা। অনেক অদল-বদলের পর তবেই তা বা'র করা হয়েছে।

আসলে কিন্তু এই এক দুই তিন গুণতে এবং লিখতে পারা, এর ভিতরেই রয়েছে গণিতের শুরু।

এক, দুই, তিন, এগুলিকে বলা হয় সংখ্যা। সংখ্যা গণনা এবং সংখ্যা লিখন—এ হচ্ছে গণিতের শাখা; গণিতের অনেকগুলি শাখার মধ্যে এটি হচ্ছে একটি।

তোমরা বড় হলে দেখবে গণিতের আরো বহু শাখা রয়েছে, যেমন বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস।

সবই কিন্তু এক রকম গণনারই সামিল। গণনা মানে হিসাব করা। তাই আরবীতে গণিতের নাম 'হিসাব'। এখনো আমরা কোনো অঙ্ক করতে গিয়ে এই হিসাব করার কথা কতোবার বলি। এই 'হিসাবই' বাংলায় আমরা যাকে বলি সংখ্যাগণিত বা পাটীগণিত।

আর এ'টি গণিতের প্রাচীনতম শাখা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণিতের জন্ম

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে কে শেখালো মানুষকে এই গণিত ? গণিত এক বিরাট হিকমত। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম দয়া মানুষের জন্য—তাই তো তিনি মানুষের উপকারের জন্য তাকে এই হিকমত শিখিয়েছেন।

আসলে, প্রথম সৃষ্টির মহালগ্নেই গণিতের সৃষ্টি।

কথাটা, একটু বুঝিয়ে বলছি। সৃষ্টির একেবারে শুরুর কথা। কল্পনা করো—এক অসীম মহাবিশ্ব। নীরব মহাশূন্য। কোথাও কিছু নাই, শুধু আছেন আল্লাহ।

তারপর আল্লাহ বললেন, "আলো হোক।" যে-ই হুকুম সে-ই কাজ। আল্লার হুকুমে আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুট্‌তে শুরু করলো, ছড়িয়ে পড়লো মহা-বিশ্বের সর্বত্র।

সৃষ্টির সেই মহা-লগ্নেই সত্যিকার সংখ্যা-গণিতের ভিত্তি হলো স্থাপিত। কারণ, গণিতের এক মহাসত্য হচ্ছে এই আলোক-রশ্মির শাশ্বত গতি-বেগ, আর সেই প্রথম দিনেই এই গতিবেগ ঠিক হয়ে গেলো।

তারপর, আল্লাহ তা'আলা করলেন কি—নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, চন্দ্র সব সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের জন্য এক সুশৃঙ্খল গাণিতিক নিয়ম ঠিক করে দিলেন; এর একচুল এদিক-ওদিক করার ক্ষমতা কারো নেই। এই সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনেই সূর্য আজ যখন পূর্বদিকে ওঠে ঠিক তার চব্বিশ ঘন্টা পরে আবার সেখানে ওঠে। চাঁদ প্রতিদিন ঠিক একই নিয়মে একই পরিমাণে বাড়ে আর কমে।

এর পরে আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন মানুষ।

বিশ্বের এই সৃষ্টিরহস্যের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ্ মানুষকে চিন্তা করতে বললেন, কারণ এই সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক বিরাট 'হিসাব'—অর্থাৎ গণিতের মূল সুর।

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ স্পষ্ট করেই বলেছেন,—এই যে দিন রাত্রির বদল হয়, এই যে চাঁদের কলা কমে বাড়ে, এগুলি তোমাদের হিসাবের সুবিধার জন্যই আমি করে দিয়েছি।

তাই আল্লার দেওয়া এই হিকমতের কোনো রদবদল হতে পারে না—এর কোনো পরিবর্তন নেই। গণিতের ভাষা আল্লারই ভাষা; যে যেভাবেই এক দুই তিন সংখ্যা লিখুক না কেন এর অন্তর্নিহিত গুণগুলি সব ভাষাতেই কিন্তু একই।

পৃথিবীতে রয়েছে বহু ভাষা, বহু তমদ্দুন—আর এদের ভিতরে রয়েছে কত মৌলিক তফাৎ।

কোনো কোনো স্থানে মানুষ করে কি—মাথা উঁচু নীচু করে 'না' বোঝায়,–কেউ আবার মাথা পাশে দুলিয়ে 'না' বোঝায়, কোথাও উঠে দাঁড়িয়ে সামনে মুখ করে কথা বলে সম্মান দেখায়,—আবার কোথাও উঠে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখায়। কোনো ভাষার গালি অন্য ভাষার আদর।

কিন্তু গণিতের ভাষা সবদেশে একই।

দুই আর তিন যোগ করলে সব ভাষাতেই পাঁচ হয়, চার কিংবা তিন হবে না কখনো, হবে না অন্য কোনো সংখ্যা।

দুনিয়াতে কতো পরীক্ষাই না চলছে—সারা বিশ্বের উপযোগী একটা ভাষা তৈরি করার জন্য। হয়তো এমন একদিন আসতে পারে—যখন সংখ্যাবাচক গণিতের উপর ভিত্তি করেই সেই ভাষা তৈরি হবে। এর আলামতও পাওয়া যাচ্ছে।

আজ বহু শত সমস্যারই তড়িৎ গতিতে সমাধান হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে। কম্পিউটারের ভাষা হচ্ছে গাণিতিক সংখ্যা।

ভাষা তমদ্দুন মানুষের সৃষ্টি, তাই বিভিন্ন দেশের মানুষের ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু গণিতের ভাষা এবং এর নিয়ম-কানুন আল্লার দেওয়া, তাই এর কোনো পরিবর্তন নেই।

সংখ্যার এই অপরিসীম ক্ষমতা এবং অপরিবর্তনীয় রূপ দেখেই এক সময় গ্রীক পণ্ডিতরা বলতেন, "সংখ্যাই হচ্ছে স্রষ্টার পরিচয়।"

তোমরা জেনে অবাক হবে, আল্লার কালাম পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার শব্দ সমষ্টির মধ্যে অতি এক গভীর রহস্যপূর্ণ গাণিতিক সম্পর্ক রয়েছে—এক অদ্ভুত হিসাবের ব্যাপার রয়েছে এর মধ্যে। আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গেছে–কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার শব্দের মধ্যে বিভিন্ন হরফের সংখ্যা '১৯'-এই সংখ্যার গুণিতক। অর্থাৎ মোট শব্দসমষ্টিকে যদি ১৯ দিয়ে ভাগ করো তাহলে মিলে যাবে। প্রত্যেক সূরার শুরুতেই আমরা পড়ি, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"—এতে আছে ১৯টি হরফ। কুরআন শরীফের মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি এবং ১১৪কে ১৯ দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষে মিলে যায়। এমনি আরো অবাক করা সংখ্যাভিত্তিক মিল রয়েছে কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরায়। তোমরা বড় হ'লে এ বিষয়ে আরো অনেক জানতে এবং বুঝতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়
সংখ্যাগণনা পদ্ধতি

কে বা কারা, কোন্ জাতি বা কোন্ দেশ যে পয়লা এই হিসাবের নিয়ম বা'র করেছিলো তা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। তবে কয়েক হাজার বছর আগে ফেরাউনের দেশ, পিরামিডের দেশ, মিসরে এই গণনার নিয়ম লোকে জানতো। শূন্যোদ্যানের দেশ ব্যাবিলনেও এই গণনার পদ্ধতি চালু ছিলো, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তবে তারা, আমরা এখন যেমন সহজে এক দুই তিন করে দশ বিশ লিখে ফেলি এমনি করে লিখতে বা বলতে পারতো না! এতো সহজ সংক্ষিপ্ত সংখ্যাচিহ্নও তখন উদ্ভাবিত হয়নি। তাতেও কিন্তু হিসাবের কোনো অসুবিধাই হতো না।

এখনো আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে যারা লিখতে পড়তে পারে না, এক থেকে একশ পর্যন্ত গুণ্‌তে জানে না। তাই বলে কি তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে না ? ঠিকই করছে। দিনের পর দিন টাকা-পয়সার হিসাব তারা ঠিকই করে যাচ্ছে। তোমরা দেখতে পাবে, এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গুণতে পারে অনেকেই, আর তার বেশী তাদের দরকারও হয় না। বয়স কত জিজ্ঞাসা করলে বলে দুই কুড়ি তিন— অর্থাৎ তেতাল্লিশ। কতো টাকার বাজার করলো জিজ্ঞাসা করলে হিসাব করে বলে— চার কুড়ি পাঁচ টাকার অর্থাৎ কিনা পঁচাশি টাকার। তাদের দৈনন্দিন জীবনের হিসাব পত্রে কুড়ি পর্যন্ত গোণা জানলেই হলো। এই কুড়ি পর্যন্ত গণনার একটা ইতিহাস আছে।

অতি প্রাচীনকালে, মানুষের পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। তখনও তারা গণনার জন্য পয়লা পয়লা ছোটো ছোটো পাল্লা ব্যবহার করতো। হাতের একটা আঙুল দিয়ে তারা এক নির্দেশ করতো। দু'টা আঙুল দিয়ে দুই এবং এক হাতের পাঁচটা আঙুল দিয়ে পাঁচ সংখ্যা বোঝাতো।

পাঁচটা আঙুলের সমষ্টিকে তারা কি বলতো সেটা খুব দরকারী কথা নয়; কিন্তু পাঁচটা জিনিস বোঝাতে তাদের কোনো অসুবিধাই হতো না। হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে ধরলেই লোকে বুঝতে পারতো—ক'টার কথা বলা হচ্ছে। এমনি করে দুই হাতের দশটা আঙুল থেকে তারা দশ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা পায়।

পরে কিন্তু গণনার এই পাল্লা বেড়ে গেলো যখন হাতের এবং পায়ের মোট কুড়িটা আঙুলে জিনিসের হিসাব করতে শিখলো—এমনি করে তারা পেলো কুড়ির ধারণা। কিন্তু এখানেই থেমে গেলো না—ধীরে ধীরে এক থেকে বহুর স্পষ্ট ধারণা মানুষের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কিন্তু সংখ্যার ধারণা এক কথা, আর সংখ্যা শিখনের নিয়ম আরেক কথা। সংখ্যা লিখতে শিখলো মানুষ আরো অনেক পরে।

এখনো পৃথিবীতে অনেক কওম আছে যাদের একটা মুখের ভাষা আছে— কিন্তু তার কোনো লিখিত রূপ নেই; তাদের কোনো হরফ নেই। শুধু মুখে মুখেই চলে আসছে তার ইতিহাস। তাদের সংখ্যারও কোনো লিখিত রূপ নেই, কিন্তু হিসাবপত্র তারা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ তো আর চিরকাল গুহায় থাকবার জন্য জন্মায়নি। সে একদিন গুহা থেকে বেরিয়ে এলো—দল বেঁধে বাস করতে শুরু করলো—অর্থাৎ মানুষ হলো সামাজিক জীব। তারা তখন বহু মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদান শুরু করলো; আর তা করতে গিয়েই দেখলো—কেবল মুখে মুখে হিসাব রাখলে চলে না, হিসাব লিখে রাখতে হবে। ফলে, একদিন সংখ্যার লিখিত রূপ দেখা দিলো।

কিন্তু তাই বলে যেন মনে করো না, একেবারে পয়লা দিনেই আজকের মতো করে এক দুই তিন লেখা শুরু হয়ে গেল। আজকের সংখ্যা লিখন রীতি পূর্ণ রূপ পেতে কয়েক হাজার বছর লেগেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সংখ্যালিখন পদ্ধতি

তোমরা গ্রামের বাড়িতে গেলে একটি জিনিস লক্ষ্য করে থাকবে। আমরা আমাদের ছোট বেলায় দেখেছি—দুধওয়ালা রোজ দুধ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মাটির দেয়ালের গায়ে চুন দিয়ে একটা করে খাড়া দাগ দিয়ে যাচ্ছে। এই ছিল তার মাসের দুধের হিসাবের খাতা। লেখাপড়া সে জানতো না, কিন্তু দুধের হিসাবে তার কোন ভুল হতো না। একটা দুটা করে বিশ ত্রিশটা খাড়া

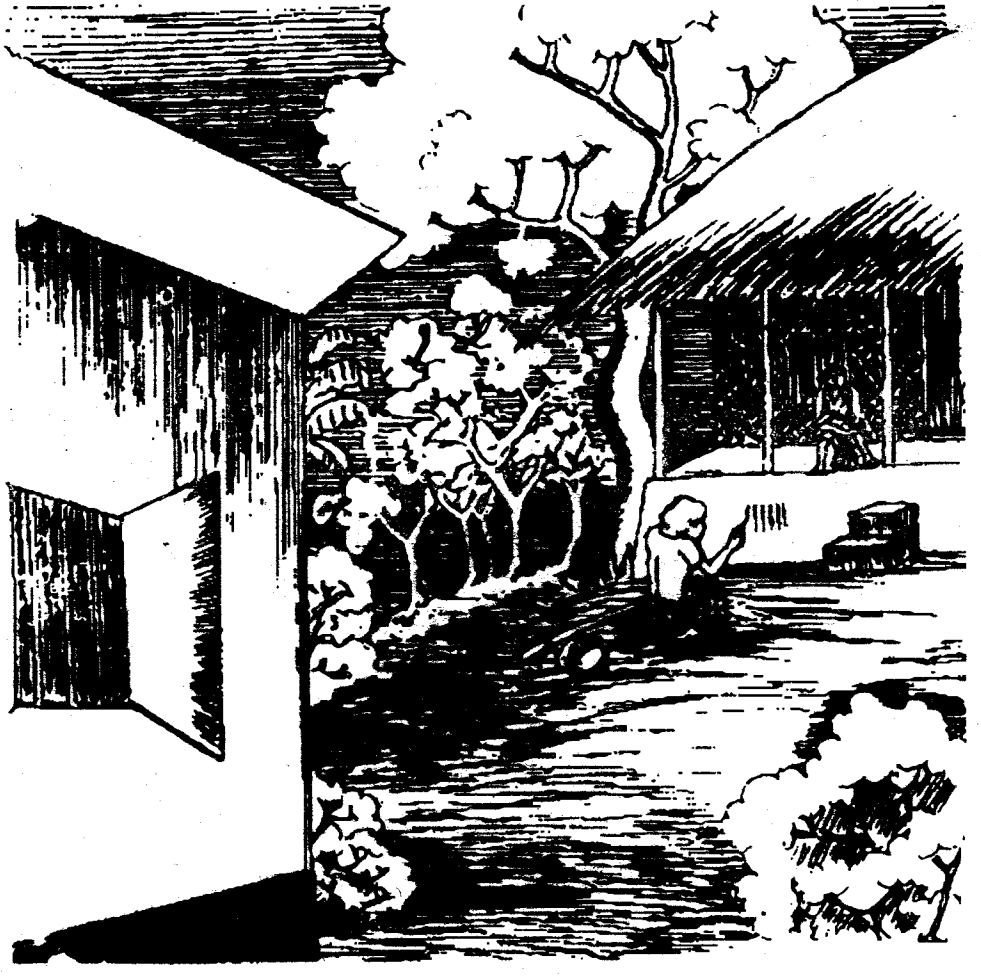

দাগ টেনে সে দিব্যি তার হিসাবের খাতা তৈরি করে নিতো। এই খাড়া দাগগুলো এক-একটা প্রতীক চিহ্ন। আমরা এক দুই তিন লিখতে যা ব্যবহার করি সেও এক-একটা প্রতীক চিহ্ন।

প্রতীকগুলি ধীরে ধীরে জন্ম লাভ করেছে। আমাদের প্রাচীন কালের পূর্বপুরুষেরা সংখ্যা লিখতে গিয়ে কখনো এমনি করে খাড়া দাগ, কখনও বা শোয়ানো দাগ টেনে কাজ চালাতো। কিন্তু বড় সংখ্যা লিখতে হলেই অসুবিধা হতো—কেননা দাগ টানতে টানতে একটা দেয়ালই ভর্তি হয়ে যেতো। তাই, তারা চিন্তা-ভাবনা করে লাইনের বিভিন্ন অবস্থান দিয়ে বিভিন্ন সংখ্যা নির্দেশ করতে শিখলো। যেমন প্রাচীন চীনারা সংখ্যা লিখতো এভাবে ঃ

ইত্যাদি,

অথবা

ইত্যাদি।

কিন্তু কালক্রমে মানুষ শেষের চিহ্নগুলিকে দশ এবং দশের গুণিতক বোধক সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করতে শিখলো। অর্থাৎ

ইত্যাদি।

তোমরা জেনে অবাক হবে, বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সবকটি প্রসিদ্ধ ভাষারই সংখ্যাবোধক প্রতীক চিহ্নগুলি উপরের প্রতীক চিহ্ন থেকেই জন্ম নিয়েছে। রোমান, আরবী, সংস্কৃত, বাংলা পদ্ধতিতে আমরা যে এক, দুই, তিন ইত্যাদি লিখি—তা তো উপরের প্রতীক চিহ্ন থেকেই বদল হতে হতে বর্তমান রূপ পেয়েছে।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রা কী করতো জানো ? তারা খাড়া গুঁজির মতো চিহ্ন ব্যবহার করে এক, দুই, তিন থেকে নয় পর্যন্ত লিখতো। আবার দশ থেকে ঊনষাট পর্যন্ত সংখ্যাগুলি শোয়ানো তীরের মতো চিহ্ন দিয়ে লিখতো। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল কুনিফর্ম। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রাই প্রথম 'ষাটকিয়া' পদ্ধতির সংখ্যা গণনার নিয়ম বার করে।

আমাদের 'শতকিয়া' পদ্ধতিতে আমরা কি করি–এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করি। আর এই ষাটকিয়া পদ্ধতিতে গণনা করা হয় এক থেকে ষাট পর্যন্ত। ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা–এই ষাটকিয়া পদ্ধতির গণনারই ইতিহাস বহন করে। আর প্রাচীন মিশরীয়রা – ওরাও খাড়া লাইন টেনে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা নির্দেশ করতো। তারপর দশ থেকে নব্বই-এর জন্য ব্যবহার করতো অন্য রকম প্রতীক। এই লিখন পদ্ধতিকে বলা হতো হায়ারোগ্লিফিক পদ্ধতি।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, চীনা, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় কোন পদ্ধতিতেই 'শূন্য-এর জন্য কোনো প্রতীক ব্যবহার করা হতো না। শূন্যের সৃষ্টি হয় অনেক পরে। মজার ব্যাপার এই যে, শূন্যের জন্য কোনো প্রতীক না থাকলেও প্রাচীনদের হাতে গণিতের অনেক উন্নতি হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বর্ণমালা দিয়ে সংখ্যা লেখা

জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ্‌র রহমত, আল্লাহ্‌র আশিস। এর উপর কারো একচেটে অধিকার নেই। কাজেই কেবল প্রাচীন মিশর এবং ব্যাবিলনেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সীমাবদ্ধ থাকলো না; গ্রীসও এসে দাঁড়ালো তাদের কাতারে। ইউরোপের একটা দেশের নাম গ্রীস। এই গ্রীসের অধিবাসীদের বলা হয় গ্রীক। খুব প্রাচীন দেশ। এই গ্রীক এবং প্রাচীন রোমরা তাদের হরফ দিয়ে সংখ্যা লিখনের রীতি চালু করে।

গ্রীকদের বর্ণমালার অক্ষরগুলো হচ্ছে α (আলফা), β (বিটা), γ (গামা), δ (ডেল্টা) ইত্যাদি। গ্রীকরা α দিয়ে এক, β দিয়ে দুই, γ দিয়ে তিন, δ দিয়ে চার বোঝাতো। এমনিভাবে বর্ণমালার অন্যান্য হরফ দিয়ে অন্যান্য সংখ্যা নির্দেশ করতো। এখানেও কিন্তু শূন্যের জন্য কোন প্রতীক-চিহ্নের ব্যবহার ছিলো না।—যদিও দশ, বিশ, ত্রিশ ইত্যাদি গণনা ঠিকই ছিলো।

রোমানদের হরফগুলো ছিলো আমাদের আজকের বড় হাতের ইংরেজী বর্ণমালা A B C D ইত্যাদি। রোমানরা কিন্তু গ্রীকদের মতো বর্ণমালার প্রথম হরফ থেকে এক দুই লেখা শুরু করলো না। তারা প্রাচীন মিশর এবং ব্যাবিলনের সংখ্যাবাচক প্রতীকের সঙ্গে মিল রেখে তাদের বর্ণমালার I (আই) দিয়ে '১' নির্দেশ করলো ; দু'টা I পরপর লিখে II দ্বারা '২' লিখলো, তিনটা I পরপর রেখে III দ্বারা '৩', চারটা I পরপর লিখে IIII দ্বারা '৪' লিখলো এবং V (ভি) দিয়ে '৫' নির্দেশ করলো। পরে V-এর ডান পাশে একটা I (আই) যোগ করে VI দ্বারা '৬' লিখলো এবং V এর বামে একটা I লিখে IV দ্বারা ৪-এর নতুন রূপ দিলো তারা।

সাধারণ নিয়ম হলো ঃ বড় মানের সংখ্যা প্রতীকের ডান পাশে I যোগ করলে মান বাড়ে এবং বাম দিকে I লিখলে মান কমে। এমনি করে X দ্বারা ১০, XX দ্বারা ২০, L দ্বারা ৫০, C দ্বারা ১০০, D দ্বারা ৫০০, M দ্বারা ১০০০ সংখ্যা নির্দেশ করা হলো। রোমান পদ্ধতিতেও শূন্যের জন্য পৃথক কোন প্রতীক নেই।

প্রাচীন আরবরাও কিন্তু এমনি করে আরবী অক্ষর দিয়ে এক দুই তিন লিখতো। আরবী অক্ষর আলিফ, বা, তা, ছা তোমরা সবাই জানো। গ্রীকদের মতো আরবরাও বর্ণমালার প্রথম অক্ষর

আলিফ দিয়ে এক বোঝাতো। আলিফ দেখতেও কিন্তু প্রাচীন মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয় '১' প্রতীকের মতোই। আরবীতে 'বা' দিয়ে দুই নির্দেশ করা হলো। কিন্তু এই পর্যন্তই। এরপর আর কোন মিল নেই। প্রাচীন আরবরাও শূন্যের জন্য কোনো পৃথক প্রতীক ব্যবহার করলো না। যদিও ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা প্রতীক। অবশ্যি পরবর্তীকালে মুসলমানরাই শূন্য প্রতীকের ব্যবহার চালু করে। অংকশাস্ত্রে এই শূন্যের ব্যবহার আরবদেরই দান। সে কথা পরে বলছি। এখন তোমাদের প্রাচীন আরবী গণনা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেবার চেষ্টা করছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন আরব গণনা পদ্ধতি

তোমরা তোমাদের কোন মুসলমান আত্মীয়ের কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র পেলে একটা জিনিস লক্ষ্য করবে—অনেকেই চিঠির শুরুতে ٧٨٦ এই তিনটি আরবী সংখ্যা লিখে দেন। আধুনিক আরবীতে এর দ্বারা ৭৮৬ এই সংখ্যাটি বোঝায়। তোমরা কি কেউ কোনদিন তোমাদের মুরুব্বিদের জিজ্ঞাসা করেছো এই আরবী হরফে চিঠির প্রথমে ৭৮৬ লেখার মানে কি ? আসলে কিন্তু এটি "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম" এই বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ! কেমন করে তা হলো তা-ই এখন তোমাদের বলছি।

প্রাচীন আরবীতে

ا = এক, ب = দুই, ج = তিন, د = চার, هـ = পাঁচ, و = ছয়, ز = সাত, ح = আট, ط = নয় এবং ى দশ নির্দেশ করতো। এর পরে ك = বিশ, ل = ত্রিশ, م = চল্লিশ, ن = পঞ্চাশ, س = ষাট, ع = সত্তর, ف = আশি, ص = নব্বই, ق = একশ, ر = দু'শ, ش = তিনশ, ت = চারশ, ث = পাঁচশ, خ = ছয়শ, ذ = সাতশ, ض = আটশ, ظ = নয়শ এবং غ = এক হাজার বোঝাতো।

এখন দেখো, بسم الله الرحمن الرحيم লিখতে উনিশটি হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরের তালিকা থেকে হরফগুলির সংখ্যাবোধক রাশিগুলি যোগ করো— যোগফল কতো হলো ? ৭৮৬ কেই আরবীতে ٧٨٦ এভাবে লেখা হয়।

এখন বুঝতে পারছো, কুরআন শরীফের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত বাক্যটিকে ৭৮৬ এই সংখ্যার দ্বারা কত সংক্ষেপে তোমাদের লিখে জানানো হলো।

এখনো প্রশ্ন ঃ আরবীতে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম না লিখে ৭৮৬ দিয়ে লেখা হয় কেন ? এটি শুধু স্থান এবং কষ্ট কমানোর জন্য ? না, তা নয়। লেখা চিঠিপত্র পড়ে অনেকে ভুল করে এখানে সেখানে ফেলে দিতে পারে, এবং হয়তো বা অজান্তে তার উপর পা ফেলতে পারে ; তাই পাক কালামের যাতে বেইজ্জতি না হয় তার জন্য এই উপায় বা'র করা হয়েছে।

একটা রহস্যের ইংগিত তোমাদের দিয়ে রাখছি ঃ তোমরা আরবী সংখ্যাবোধক হরফগুলি দিয়ে সুন্দরভাবে "কোডে" তোমাদের নাম লিখতে পারো। সহজে কেউই ধরতে পারবে না।

সপ্তম অধ্যায়

নতুন গণিতের সৃষ্টিতে মুসলমানের দান

তোমরা আরো বড়ো হলে জানতে পারবে—হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তেকালের একশ বছরের মধ্যেই মুসলমানরা সেকালের সভ্যজগতের প্রায় সবটাই দখল করে নেয়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য, ভারতের পশ্চিমাংশ, সমগ্র উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের স্পেন মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই বিখ্যাত হাদীস তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো—"জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে চীনদেশ পর্যন্ত যাও।"

এই আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়েই মুসলমানরা যেসব দেশ জয় করলো সব জায়গায় নিয়ে গেলো জ্ঞানের মশাল। দেশ জয় করলো বটে, কিন্তু যারা হেরে গেলো, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মুসলমানরা প্রধান সম্পদ বলে গ্রহণ করলো—জ্ঞান যে মুসলমানদের হারানো সম্পদ। তারা ভিন জাতিদের কাছ থেকে পাওয়া সেই জ্ঞানকে নিজের মতো করে নিয়ে জ্ঞানের আলোতে দুনিয়াকে উজ্জ্বল করে দিলো। মুসলমানদের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভের জন্য বিজিত দেশের বাইরে থেকেও বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে এসে ভিড় জমায়। সেই পশ্চিমে স্পেনের কর্ডোভা-গ্রানাডা, আর পূর্বে বাগদাদ—বহু শত বছর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলোর কেন্দ্র হয়ে রইলো।

পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টানরা তখন ধর্মের নামে নিজেদের মধ্যে হানাহানি মারামারি করছে—কেউ নতুন কিছু বললে তাকে শূলে চড়াচ্ছে, পুড়িয়ে মারছে। সেই সময় মুসলিম পণ্ডিতেরা গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় একের পর এক নতুন আবিষ্কার করে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেন।

এমনি এক মুসলিম মনীষী, নাম তাঁর মুহাম্মদ ইব্নে মূসা আল খোয়ারিজমি। তিনি বাস করতেন বর্তমান ইরানের উত্তরে খোরাসান প্রদেশের খোয়ারিজম শহরে। আজ পৃথিবীর সবাই তাঁকে 'আল্-খোয়ারিজমী' বলে চেনে।

আনুমানিক ৮২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি বেঁচে ছিলেন। গণিতের নানা শাখার উপর বহু মৌলিক বই লিখে গেছেন। তবে তাঁর একখানা বই হচ্ছে যুগান্তকারী ; এই বইটি গণিতের

জগতে বিরাট আলোড়ন এনে দেয়। বইটির নামটা একটু বড়—তবু সারা পৃথিবীর গণিতবিদদের কাছে এ নামটা এত প্রিয় যে, তা বলার নয়।

বইটির নাম হচ্ছে 'হিসাব আলজিবর ওয়াল মুকাবালাহ'। বলতে গেলে এই বইটি দিয়েই আধুনিক গণিতের জয়যাত্রা শুরু হয়।

এই বই-এর বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে বলা হয় আলজিবর বা এলজাব্রা অর্থাৎ বীজগণিত।

'বীজগণিত' একটি বিশেষ ধরনের হিসাবপদ্ধতি। এবং এই বইতেই সারা বিশ্ব প্রথম গণনা পদ্ধতিতে শূন্যের জন্য একটা বিশেষ প্রতীক-চিহ্ন দেখতে পায়। প্রথমে শূন্যের জন্য একটা ভারি ফোঁটা ব্যবহার করা হয়। কালক্রমে, বিভিন্ন ভাষায় তা একটা ছোট গোল বলের আকার ধারণ করে।

আরবী ভাষার সাহায্যেই এই নতুন সংখ্যা লিখন পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচারিত হলো। আর এজন্যই বর্তমান গণিত শাস্ত্রে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০ এই দশটি সংখ্যাকে "আরবী সংখ্যা পদ্ধতি" বলা হয়।

প্রাচীন ভারতের গণিতবিদদের অনেক বই বাগদাদে আরবীতে তর্জমা করা হয়। আল্-খোয়ারিজমী তাঁর বই আলজিবর-এর মুখবন্ধে স্বীকার করেন তিনি এই নতুন ধরনের লিখন পদ্ধতির ধারণা এসব বই থেকেই পেয়েছিলেন।

কিন্তু এই পদ্ধতির খোঁজ পেয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকলেন না—তাঁরা একে আরো উন্নত করলেন, নতুন করে সাজালেন, তাই বলা যায় বিকাশ ঘটালেন, এর আধুনিক রূপ দিলেন। এসবই আরব বিজ্ঞানীদের অবদান। আজ আরবী সংখ্যা লিখন পদ্ধতিকে কেউ কেউ "ইন্দ-আরব সংখ্যা পদ্ধতি" বলেও থাকেন।

আল্-খোয়ারিজমীর পরে গণিতের এই নতুন শাখায় অবদান রাখেন আরো অনেকে; তাঁদের মধ্যে দশম শতকের মিশরীয় মুসলিম গণিতবিদ আল কামিল, খোরাসানী মুসলিম পণ্ডিত আবুল ওয়াফা, বাগদাদের আল-কার্কী প্রধান। আল্-খোয়ারিজমীর আবিষ্কৃত এই যে বিশেষ পদ্ধতি অর্থাৎ বীজগণিত-এর সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল প্রকার লেনদেনের হিসাব, সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা অতি সুন্দরভাবে করা যায়।

তাই আজ আল-খোয়ারিজমীর নাম অনুসারে বিশেষ এক ধরনের হিসাব পদ্ধতিকে আল্ গরিদম (Algorithm) বলা হয়। আজকাল তোমরা কম্পিউটারের কথা প্রায়ই কাগজে পড়ো। এ গণনা পদ্ধতিতে 'আল্ গরিদমের'ই চরম বিকাশ ঘটেছে।

আধুনিক গণনা পদ্ধতিতে 'শূন্য' এই প্রতীকটি এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শূন্যের আসল অর্থ কিন্তু 'নাই'। তাই আরবীতে শূন্যকে বলা হয় 'সিফর'। এই 'সিফর' কথাটাই পরিবর্তিত হয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় হয়েছে 'সাইফার' বা 'জিরো'।

আজকাল আমাদের লোকেরা ইউরোপ আমেরিকার খ্রিস্টান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়তে যায়। সেকালে ব্যাপার ছিলো উল্টো। তখন মুসলিম স্পেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই ইউরোপের খ্রিস্টান ছাত্ররা পড়তে আসতো। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়েই ওরা মুসলিম গণিত এবং গণিতবিদদের সংস্পর্শে আসে। পরে তাঁরা এইসব আরবী গণিতের বই ল্যাটিনে অনুবাদ করে নিজ নিজ দেশে নিয়ে যায়। আর এমনি করেই পাশ্চাত্যে আধুনিক গণিতের জন্ম হয়।

আমাদের গর্বের কথা—আল্-খোয়ারিজমীর 'আলজিবর' কিতাবখানি একাই পাশ্চাত্যের শিক্ষা বিপ্লবে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এতক্ষণ ধরে তোমরা গণিতের দু'টি প্রাচীনতম শাখা পাটীগণিত বা সংখ্যা গণিত এবং বীজগণিতের জন্মকথা সম্বন্ধে কিছু ধারণা পেলে ; এখন সংখ্যা গণিতের দু'একটি চমকপ্রদ অংকের কথা তোমাদের বলবো।

অষ্টম অধ্যায়

অংকের আনন্দ

তোমরা অনেকেই গণিত বা অংকের কথা শুনলে ঘাবড়ে যাও। পৃথিবীর সব দেশেই কোনো কোনো ছেলেমেয়ের মধ্যে এ ধরনের একটা ভয় দেখা যায়। আর এও দেখা যায়, ক্লাসে অংক দেওয়ার সাথে সাথেই কোনো কোনো ছেলেমেয়ে খুব তাড়াতাড়ি অংক কষে উত্তর বার করে ফেলেছে।

আসল কথা কি—সংখ্যার মারপ্যাঁচ কারো কারো কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলেও অংকের মধ্যে কিন্তু মস্তবড় এক আনন্দের খোরাক লুকিয়ে আছে। বিভিন্ন সংখ্যা দ্বারা গঠিত অংকগুলির রহস্য যে ভেদ করতে পেরেছে তার কাছে গণিত এক অপার আনন্দের খনি।

আজকাল গণিতকে বিজ্ঞান জগতের মহারানী বলা হয়। এই যে বিজ্ঞানের এতো জয়জয়কার তার মূলে গণিতের দান অসীম। গণিতের ব্যবহারিক উপকারিতা তো আছেই ; এর একটা নিজস্ব সৌন্দর্যও আছে ; এই সৌন্দর্য এমনি যে, এর আকর্ষণে বহু মানুষ ছুটে এসেছে এর কাছে এবং শুধু গণিত চর্চার আনন্দেই গণিতের সাধনা করেছে।

তোমরা নিজেরাও তো অনেক সময় অংকের খেলা খেলেছ, অংকের ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছো আর ধাঁধাটার উত্তর বার করতে পারলে খুশিতে লাফিয়ে উঠেছ।

কোন কোন ধাঁধা কিন্তু আসলে ধাঁধাই নয়, তার সমাধানের জন্য বিশেষ নিয়ম আছে এবং সে নিয়ম না জানলে যত চেষ্টাই করো না কেন ধাঁধার উত্তর কিছুতেই খুঁজে পাবে না।

যেমন ধরো, তোমার ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়া বড়ো ভাই একদিন স্কুল থেকে এসে খুব ভারিক্কি চালে তোমার কাছে বলতে লাগলো ঃ

তিন অংকের যে কোন একটা সংখ্যা মনে মনে ঠিক করো, আমাকে কিছুই বলবে না। এখন এই সংখ্যার অংকগুলি সব যোগ করো। এই যোগফলকে আগের সংখ্যা থেকে বিয়োগ করো। এখন বিয়োগফলের তিনটা অংকের যে কোনো একটা অংক কেটে দাও আর বাকি দুটা অংকের যোগফলটা আমার কাছে বলো। আমি চট করে তুমি কোন অংকটা কেটে দিয়েছিলে সেটা বলে দেবো।

নিয়মটা যে জানে না তার কাছে কিন্তু এটা একটা ম্যাজিক। আসলে এর মধ্যে কোনো ম্যাজিক নেই। আছে সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি কেরামতি। বীজগণিতের সাহায্যে এ অংক খুব সহজে করা যায়। তোমরা বড়ো হলে নিজেরাই তা করতে পারবে।

আরো একটা অংকের হিসাব বলছি, যেটা গ্রামের সাধারণ লোকেও মুখে মুখে করতে পারে। দুই গাছে দুই দল পাখি বসে আছে। একদল আর একদলকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'তোমরা কতজন ?' ও-দল উত্তরে বললো, "তোমাদের একজন আমাদের এখানে এলে আমরা তোমাদের দ্বিগুণ হই আর আমাদের একজন তোমাদের ওখানে গেলে আমরা উভয়ই সমান হয়ে যাই।" কোন্ গাছে কতো পাখি আছে বলো দেখি।

অনেকেই হিসাব করে এর সঠিক উত্তর বলে দিতে পারে। বড়ো হলে তোমরা দেখবে, বীজগণিতের সাহায্যে কতো সুন্দরভাবে তোমরা এসব অংক করতে পারো।

এইবার একটা মাথা ঘামানোর অংকের ধাঁধা বলছি, এর উত্তর যে বলতে পারবে বুঝতে হবে, সে সত্যিই অংকে ভালো।

দাদা আর নাতির মধ্যে কথা হচ্ছে। নাতি বলছে, "১৯৩২ সালে, আমি আমার জন্মসনের শেষের দুই অংক দিয়ে যে সংখ্যা হয় ঠিক ততো বছর বয়সের ছিলাম। কথাট শুনে দাদা অবাক হন এবং নাতিকে অবাক করে দিয়ে বললেন, "আরে! আমারও ঠিক তাই।" নাতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বললো, "এ তো একেবারেই অসম্ভব।" দাদা বললেন, "মোটেই অসম্ভব না, দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।" তোমরা বলতো ১৯৩২ সালে দাদা আর নাতি, কে কতো বছরের ছিলো ?

এইবার একটা সোজা অংকের হিসাব করো দেখি। একটা পুকুরে একটা আজব পদ্ম গাছ, তার একটা পাতা। পাতাটা রোজ বেড়ে আগের দিনের দ্বিগুণ হয়ে যায়। এমনি করে ৩ দিনে পাতাটা সারা পুকুর ছেয়ে ফেললো। কবে পাতাটা পুকুরের অর্ধেক ছেয়েছিলো ?

এসব অংকের উত্তর দিতে গেলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ক্ষুরধার বুদ্ধি। আর অংকের চর্চা মানুষের বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করে তোলে।

নবম অধ্যায়

গণিতের তৃতীয় শাখা জ্যামিতির জন্ম

তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাছে কতোটা মার্বেল আছে, তুমি অমনি এক, দুই, তিন করে গুণে বলে দেবে এতোটা মার্বেল আছে। কিন্তু তোমার বালতিতে কতোটা দুধ আছে বললে তুমি কি দুধ গুণতে বসবে? বরং ওজন করে বলবে এত সের দুধ আছে।

আবার যদি তোমাকে বলি এই ঘরটায় কতোটা জায়গা আছে? তখন তুমি ওজনও করবে না বা কিছু গুণতেও বসবে না। একটা স্কেল নিয়ে ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে গুণ করে বলবে এত বর্গফুট জায়গা আছে। তাহলে দেখো, জায়গার পরিমাণ বলতে তার ক্ষেত্রফল বা আয়তন বোঝায় এবং সে আয়তন জানতে গেলে মাপের দরকার হয়।

এই ক্ষেত্রফল মাপার প্রয়োজনে গণিতের যে শাখার সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বলে 'জ্যামিতি'। আসলে কথাটা হওয়া উচিত ছিল 'ভূমিতি', কারণ ক্ষেত-খামার জমিজমার মাপ থেকেই এই বিজ্ঞানের জন্ম।

ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যেই এই ক্ষেত্রফল মাপার রীতি দেখা যায়। তোমরা শুনে থাকবে, মিশরকে নীল নদের দান বলা হয়। নীল নদ পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলির একটি। বর্ষাকালে এই নদের বানে মিশরের উত্তর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যেতো। বর্ষার পরে পলি-পড়া উর্বর জমি জেগে উঠতো।

মিশরের বাদশা এই উর্বর জমি প্রজাদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা করে দিতেন এবং তার বদলে খাজনা আদায় করতেন। জমির পরিমাণ অনুযায়ী খাজনার পরিমাণ ঠিক হতো।

সুতরাং বিভিন্ন মাপের জমির আয়তন ঠিকভাবে নিরূপণ করার প্রয়োজন হতো ; এ থেকেই বিভিন্ন আকারের জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার নিয়ম বার করা হয়। কোনোটা বর্গাকার, কোনোটা আয়তাকার, কোনোটা ত্রিভুজাকার জমি—কিন্তু এদের ক্ষেত্রফল যদি সমান হয়, তবে খাজনাও সমান হতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রাচীন মিশরকে তাই জ্যামিতির সূতিকাগার বলা যেতে পারে।

প্রাচীন মিশরের এসব জ্যামিতি চর্চার সূত্র পাওয়া গেছে আধুনিককালে খুঁজে পাওয়া ফেরাউন আমলের কিছু কিছু প্যাপিরাস থেকে।

প্যাপিরাস এক রকম খুব মজবুত কাগজের মতো। এই প্যাপিরাস কথা থেকেই ইংরেজী পেপার কথা এসেছে।

মিশরের গরম আবহাওয়ার দরুন এই প্যাপিরাসগুলি কালের করাল গ্রাস উপেক্ষা করে প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই ছিলো। কিন্তু প্যাপিরাসের চেয়ে বড়ো সাক্ষী রয়েছে কালজয়ী পিরামিডগুলি। মিশরের জ্যামিতি জ্ঞানের সবচেয়ে বড়ো স্বাক্ষর এগুলি। আজো লোকে অবাক হয়ে ভাবে—কেমন করে এত নিখুঁত জ্যামিতিক গঠনপ্রণালী সেই আমলে মিশরীয়রা আয়ত্ত করেছিলো।

দশম অধ্যায়

আধুনিক জ্যামিতির জন্ম

যখন ফেরাউনদের বাদশাহী শেষ হয়ে গেল তখন মিসরের উত্তর অংশ গ্রীকদের অধিকারে চলে যায়। মিসর তখন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গণিত চর্চার একটি বিরাট কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ভূমধ্যসাগর তীরে আলেকজান্দ্রিয়া শহর ছিল এই বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। গ্রীস দেশ থেকে গণিতের বহু ছাত্র মিসরের শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশুনা করতে আসতো।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে পিথাগোরাস নামে এক গ্রীক ছাত্র আসেন মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় পড়াশোনা করতে। পিথাগোরাস যখন মিসরে ছাত্র তখন পারস্যের রাজা অভিযান চালিয়ে মিসর এবং গ্রীস দখল করে নেন। পিথাগোরাস দখলদার বাহিনীর হাতে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ব্যাবিলনে চলে যান এবং সেখানেই প্রায় কুড়ি বাইশ বছর কাটান। এই কুড়ি বাইশ বছর পিথাগোরাস ব্যাবিলনের বিভিন্ন স্থান সফর করেন ; এমনি করে তিনি ব্যাবিলনীয় গণিত শাস্ত্র, বিশেষ করে, পাটীগণিতের সাথে পরিচিত হন।

ব্যাবিলনীয় সংখ্যাগণিত সেই সময় খুবই উন্নত ছিল। ওখানে থাকতে থাকতেই সংখ্যাগণিতের একজন ভয়ানক ভক্ত হয়ে ওঠেন পিথাগোরাস। পরে যখন তিনি আবার জন্মভূমি গ্রীসে ফিরে আসেন তখন খুব জোরেশোরে সংখ্যার মাহাত্ম্য প্রচার করতে লাগলেন।

পিথাগোরাস বলতে লাগলেন পৃথিবীর যা কিছু আছে সব কিছুকেই পূর্ণ সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

কিন্তু একটা আঘাত খেয়ে পিথাগোরাস মুষড়ে পড়লেন। দেখা গেলো, একটা সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ এর সমান বাহু দু'টি প্রত্যেকে এক ফুট করে লম্বা। কিন্তু অতিভুজের দৈর্ঘ্য কোন ক্রমেই একটা পূর্ণ সংখ্যা বা সসীম ভগ্নাংশ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। অথচ একটি স্কেল দিয়ে কতো সহজে আমরা ঐ ত্রিভুজটি আঁকতে পারি এবং তার অতিভুজও আঁকতে পারি।

পিথাগোরাসের তখন মনে হলো, সংখ্যাগণিতের চেয়ে জ্যামিতির শক্তি অনেক বেশী। এই পিথাগোরাসই জ্যামিতির একটি মৌলিক উপপাদ্যের জন্মদাতা। দুনিয়ায় সেটি 'পিথাগোরাসের উপপাদ্য' নামে মশহুর হয়ে আছে। তোমরা আরো উঁচু ক্লাসে উঠলে পিথাগোরাসের এই উপপাদ্য বুঝতে পারবে। সংক্ষেপে উপপাদ্যটি হলো ঃ একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের

দুই পাশের দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের যোগফল অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান।

পিথাগোরাসের পর তাঁর শিষ্যেরা জ্যামিতির বহু উন্নতি সাধন করেন। এক কথায়, আজকের স্কুল জ্যামিতির অধিকাংশই সেই পিথাগোরাসের আমলের জ্যামিতি।

পিথাগোরাসের আমল থেকে হযরত ঈসার জন্মের দু'শো বছর আগে পর্যন্ত সময়টা গ্রীক জ্যামিতির তথা সনাতন জ্যামিতির স্বর্ণযুগ। এই যুগের সমস্ত সম্পাদ্য ও উপপাদ্য সংগ্রহ করে গ্রীক গণিতবিদ ইউক্লিড ১৩ (তের) খণ্ডে বিভক্ত এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এর নাম 'ইউক্লিডীয় জ্যামিতি'।

গ্রীস, মিসর, বাইজানটাইন বিজয়ের পর ইউক্লিডীয় জ্যামিতি এসে পড়লো মুসলিম পণ্ডিতদের হাতে। মুসলিম পণ্ডিতরা করলেন কি–এই জ্যামিতির আরবী তরজমা করে সারা মুসলিম বিশ্বে প্রচার করলেন। পরে এই আরবী তরজমার ল্যাটিন তরজমা করেন ইউরোপীয় গণিতবিদেরা। এভাবে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ল্যাটিন সংস্করণ সারা ইউরোপে প্রচারিত হয়।

মুসলিম গণিতবিদ হাজি খলিফা, ইসহাক বিন সাবিত, নাসিরুদ্দিন আল তুসী প্রমুখ ইউক্লিডীয় জ্যামিতির আরবী তরজমা করেন। এ ছাড়া আবুল ওয়াফা, আল্‌কিন্দি, আবু সিনা প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিত ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উপর অনেক সারগর্ভ মন্তব্য রাখেন। এসবের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান কালের বহু গ্রন্থকার ইউক্লিডীয় জ্যামিতির বহু পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং নতুন নতুন জ্যামিতি সৃষ্টি করেছেন।

তোমরা বড় হলে জানতে পারবে জ্যামিতির একটি বিশেষ শাখার নাম ত্রিকোণমিতি। ত্রিভুজের তিনটি কোণ এবং তিনটি বাহু নিয়ে এর কারবার। এই ত্রিকোণমিতির সৃষ্টি এবং বর্তমান উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলিম পণ্ডিতদের দান।

জ্যোতির্বিদ্যায় এই ত্রিকোণমিতির প্রয়োজন অপরিসীম। মুসলিম জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদেরা ত্রিকোণমিতির বহু তত্ত্ব এবং তথ্য আবিষ্কার করে জ্যোতির্বিদ্যার বিপুল উৎকর্ষ সাধন করেছেন।

একাদশ অধ্যায়

উপসংহার

মুসলিম খলিফা এবং বাদশাদের বেশীর ভাগই ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসাহদাতা। জ্ঞান চর্চার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) খুব তাগিদ দিতেন। মুসলিম রাজা-বাদশারা ইসলামের এই প্রেরণায়ই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য অকাতরে ধন-সম্পদ ব্যয় করেন। যেসব পণ্ডিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন তাঁদেরকে তাঁরা দরবারে স্থান দিতেন, ইজ্জত করতেন, অর্থ-বিত্ত দিয়ে সাহায্য করতেন। এর ফলেই মুসলিম পণ্ডিতেরা নষ্টপ্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কেবল উদ্ধারই করলেন, তা নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম দিলেন।

বাগদাদের খলিফা আল-মামুন ও খলিফা হারুন-অর-রশীদ-এর নাম গণিত চর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁদের দরবারে অনেক পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিলো; এঁরাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান সংগ্রহ করেন এবং সে জ্ঞানকে আরো সহজ করে বিশ্বের দরবারে নতুন করে পেশ করেন। তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান পেলো নতুন প্রাণ, নতুন উদ্দীপনা। তাই বলা যায় আধুনিক গণিতের নবজন্মের মূলে রয়েছেন মুসলিম মনীষীরা; তাঁরা গণিতকে হাতে তুলে না নিলে গণিতের বহু মূল্যবান দিকই চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতো। এ জন্য গোটা বিশ্বমুসলিম মনীষীদের কাছে চিরঋণী।

তোমরা বড় হলে গণিতে মুসলিম পণ্ডিতদের দান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে।

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৩৫০৭(উ)—৩,২৫০